সঞ্চিতা (নির্বাচিত কবিতা)

—কাজি নজরুল ইসলাম

❑ কবি-জীবনী ❑

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যাহাদের ক-অক্ষর জ্ঞান আছে কিংবা নাই—এমন সব লোকেরই প্রিয় নাম নজরুল ইসলাম। নামটি আপামর জনসাধারণের কাছে একটি বিস্ময়ের চিহ্ন স্বরূপ—বাংলা সাহিত্যের কাছে সৌভাগ্যের শুভ তিলক; সত্য সত্যই এমন একজন বিস্ময়কর প্রতিভার ধারক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অতি বিরল।

নজরুল শুধুমাত্র কবি ছিলেন না, ঔপন্যাসিকও না, সংগীত রচয়িতা কিংবা গায়কও নহেন—সমস্ত সুকুমার শিল্পকলারই রসস্রষ্টা ছিলেন তিনি এবং সর্বোপরি বেদনা জর্জরিত মানুষের বন্ধু এবং দোসর। তাঁহার কাছে মানবতাবোধই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা—মূল কথা। জাতি, ধর্ম, নোংরা রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে ছিল তাঁহার আসন। তাই তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন—'কাণ্ডারী ! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।' এইরূপ অসাম্প্রদায়িকতা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের কথা আর কতজন কবি বলিতে পারিয়াছেন ?

পরাধীন ভারতবর্ষে দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের অপরাধে (!) তাঁহাকে ইংরেজ সরকারের হাতে বারবার অকথ্য লাঞ্ছনা, কারাবাস, পুস্তক পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করণ প্রভৃতি নানা ধরনের শাস্তি বরণ করিতে হইয়াছে। তথাপি তাঁহার অপরাজেয় প্রাণশক্তি এতটুকু দমিত হয় নাই। তাঁহার বিদ্রোহী আত্মা সামাজিক, রাজনৈতিক—সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারংবার তীব্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে—যাহার মূলমন্ত্র 'বল বীর বল চির উন্নত মম শির।' 'কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়,—সমগ্র বাঙালি জাতির স্বপ্ন।'—সুভাষচন্দ্র। কবির উপন্যাস 'কুহেলিকায়' তাঁহার এই স্বপ্নের কথা একটি চরিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে—"আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম ! আমার ভারতবর্ষ,—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ; ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের মহামানুষের মহা-ভারত।"

ইহাই কবি নজরুলের মহাপ্রাণের গোপন কথা।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুরুলিয়া নামক এক গণ্ডগ্রামে ২৪ মে, ১৮৯৯ সালে এক দুস্থ অথচ ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান সংস্কৃতিশীল মুসলমান পরিবারে নজরুল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাজি ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের ডাকনাম ছিল দুখু মিঞা। অতি বাল্য বয়সে নজরুল পিতাকে হারান। ফলে অতীব দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁহাকে দিনযাপন করিতে হইয়াছে। স্কুল কলেজীয় বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গ্রাম্য যাত্রাদল, নাট্য দলের গান লিখিয়া দিতেন এবং কখনো কখনো নিজেও গানে অংশগ্রহণ করিতেন।

দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি যোগদান করেন এবং সৈন্য বিভাগের একজন পাঞ্জাবি মৌলবির নিকট ফারসি ভাষা শিক্ষালাভে তাঁহার কবিদৃষ্টি আরও বিস্তৃতি পায়। ১৯১৯ সালে কবি যুদ্ধ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং সাহিত্যচর্চায় পূর্ণমাত্রায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে 'ধূমকেতু' 'নবযুগ' 'লাঙল' নামক সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় ও অগ্নিময়ী কবিতা রচনায় তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কবিকে গ্রেপ্তার করে। জেলে গিয়াও কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালান।

"কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট" জেলে বসিয়াই গাহিতে শুরু করেন। জেল বিভাগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। সমগ্র দেশের অনুরোধেও কবি অনশন হইতে বিরত হন নাই। অবশেষে মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর আদেশে অনশন ভঙ্গ করেন। মাতৃরূপী বিরজাসুন্দরীর নিকট এই বিদ্রোহী কবি ছিলেন শিশুর মতো অসহায়। তাঁহার আদেশ কবির অমান্য করিবার সাধ্য ছিল না।

১৯২৪ সালে কবি অসবর্ণ বিবাহ করেন। বিবাহ পরবর্তী কিছুকাল ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়া ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পুস্তকের স্বত্ব পর্যন্ত বিক্রয় করিয়াছেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া কবিকে সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬০ খ্রিঃ ভারত সরকার কবিকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯৬৫ খ্রিঃ এক লক্ষ টাকার সম্মান পুরস্কার দেন।

১৯৪২ খ্রিঃ হইতে কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁহাকে নিজ রাষ্ট্রে কিছুকাল রাখিয়া নিজেদেরই সম্মানিত করিয়াছিল।

অবশেষে ১২ ভাদ্র, (ইং ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬) ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ মাত্র সাতাত্তর বৎসর বয়সে ঢাকার (বাংলাদেশ) পি. জি. হাসপাতালে স্বজনহীন অবস্থায় এই বিদ্রোহী বীরের অগ্নিবীণা থামিয়া যায়—তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

❑ নজরুলের কাব্যগ্রন্থ ❑

অগ্নিবীণা (১৯২২), ছায়ানট (১৯২৩), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙ্গার গান (১৯২৪), ফণিমনসা (১৯২৪), পূবের হাওয়া (১৯২৫), চিত্তনামা (১৯২৫), সাম্যবাদ (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), বুলবুল (১৯২৮), জিঞ্জির (১৯২৮), চোখের চাতক (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), সুরাসাকী (১৯৩২), জুলফিকার (১৯৩২), চন্দ্রবিন্দু (ব্যঙ্গারসাত্মক কবিতা সংকলন) এবং আরও কয়েকখানি।

সংগীত—প্রায় চার হাজার। **গল্পগ্রন্থ**—ব্যথার দান (১৯২১), রিক্তের বেদন (১৯২৬), সোনালী স্বপ্ন (১৯৩৩) প্রভৃতি। **উপন্যাস**—কুহেলিকা (১৩৩১), জীবনের জয়যাত্রা (১৯৩৯) প্রভৃতি। **নাটক**—ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া (১৯৩২) প্রভৃতি। **প্রবন্ধ** ঃ রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী প্রভৃতি।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৩৩৭) ইত্যাদি।

❑ কবি প্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ❑

কাব্যবটবৃক্ষ রবীন্দ্রনাথের শীতল ছায়ার কোমল স্পর্শ কবি নজরুলও যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। জগৎ ও জীবনকে নূতনভাবে দেখিবার, চিনিবার দৃষ্টি পাইয়াছেন। বুঝিয়াছেন, মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বের অপমান সহ্য করা অন্যায়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই জীবন সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই দেখি—"আত্মবিস্মৃত মানুষের আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধি জাগানো তাঁর কাব্যের অন্যতম লক্ষ্য। মানুষের দুঃখকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন আর এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের মূলে দেখেছেন মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বের অবমাননা ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অক্লান্তভাবে অগ্নি উদ্‌গীরণ করেছে বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের মতো।"

কবি নজরুলের কাব্য-দর্শনের মূলে তাঁহার দুঃখকষ্ট জর্জরিত বেশ কয়েকটি বৎসরও পরোক্ষে ক্রিয়াশীল। নিজের দুঃখ ভোগের-যন্ত্রণার কষ্টিপাথরে অপরের দুঃখকষ্টকে তাই অনায়াসে ধরিয়া দেখিতে পারিয়াছেন—চিনিতে এবং বুঝিতেও তাই ভুল হয় নাই।

তারপর যুদ্ধে যোগদান করিয়া, জেলে গিয়া এবং তদানীন্তন কালের দেশ সেবকদের দেশপ্রেমের জন্য আত্মবলিদানের উদাহরণ চোখের সম্মুখে দেখিয়া এবং ইংরেজ সরকারের নিদারুণ লাঞ্ছনা ও

পীড়নের চেহারা অনুভব করিয়া নজরুলের কবি-হৃদয় বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া পারে নাই। তিনি না বলিয়া পারেন নাই 'আমি ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।' বজ্রের মতো কঠিন এবং ফুলের মতো কোমল সত্তা তাঁহার হৃদয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহই আনিয়া দিয়াছে। সেইজন্যই নজরুল একাধারে বিদ্রোহী কবি এবং অন্যধারে প্রেমিক কবি। সেইজন্যই তিনি যেমন বলেন 'শির নেহারি আমারই নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রীর' এবং তেমনি পরক্ষণেই বলিতে পারেন 'আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই' কিংবা 'আমার প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,

বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।'

অথবা, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল।'

নজরুলের 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সর্বহারা' প্রভৃতি অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ, এবং তাঁহার অজস্র গানে উপরিউক্ত মন্তব্যের উজ্জ্বল প্রমাণ মিলিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে রবীন্দ্র ছায়ার নজরুলের কবিদৃষ্টি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে কবির বিখ্যাত কবিতাগুলির উৎস সন্ধান করিতে গেলে। রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত আশা' এবং 'বিজয়ী' কবিতা দুইটি হইতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাইয়াছেন নজরুল তাঁহার বিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' ও 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার কালে। অবশ্য নজরুল ইহাতে যোগ করিয়াছেন 'বেগের আবেগ'। সমালোচকের মতে, নজরুলের 'অগ্নিবীণা' নামকরণও রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি হইতে গৃহীত।

গানটির শুরু—

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে,
আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে।

এমনি ধারা আরও অনেক প্রমাণ অসম্ভব নয় যাহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা নজরুলকে কতখানি শক্তিশালী করিয়াছে তাহা বোধগম্য হইতে পারে। নজরুলের রচনাকেও রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি 'বসন্ত' উৎসর্গ করিয়াছেন নজরুলের নামে।

নজরুল কবি-স্বভাবের আর একটি বিশিষ্ট এবং মহৎ দিক ধর্মের গোঁড়ামি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নতা। 'ধর্মের নামে বজ্জাতি'কে তিনি কায়মনোবাক্যে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছেন। "নজরুলের কবি প্রকৃতি যে ধর্মের গন্ডির মাপে গড়িয়া উঠে নাই তাহার পরিচয় কবিতাগুলির মধ্যে,—'রক্তাম্বর ধারিণী মা' এবং 'আগমনী'ও আছে, আবার 'কোরবানী' এবং 'মোহর্‌রম্‌'ও আছে।"

নজরুল নিঃসন্দেহে রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবি ভিন্ন এত আবেগ বিহ্বলতা কিংবা এত প্রচন্ড শক্তির উচ্ছ্বাস প্রবণতা কখনই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আবেগ প্রবণতা এত অধিক পরিমাণে তাঁহার কাব্যে প্রকাশমান যাহার ফলে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক কবিতার সৌন্দর্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'Emotion tranquilated' হইবার পূর্বেই আবেগের তাড়নায় কবি কলম ধরিয়াছেন। ফলে, পরিমিতি বোধের অভাবে অনেক সুন্দর কবিতা সৌন্দর্য হারাইতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে তৎসম, অর্ধতৎসম, বিদেশি শব্দের প্রয়োগে এবং নূতনত্ব আনিবার প্রয়াসে : কবিতার রস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আবেগের অতিরিক্ততার জন্য কবি এই সমস্ত দিকগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের নজরুল সম্পর্কিত সমালোচনা অবশ্য স্মরণীয় মনে করি। ড. সেনের মতে "নজরুলের কবিতার বিশিষ্টতা ছন্দের চপলতায় ও বাগ্‌ভঙ্গির ওজস্বিতায়। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সঙ্গে আরবি-ফরাসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার রচনা রীতিকে যশস্বী করিয়াছে। তবে শব্দভার-সাম্যের অভাবে কোনো কোনো কবিতা অত্যন্ত অস্বচ্ছ ও দুর্বল হইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া আবেগের অকৃত্রিমতা ও অধীর তীব্রতা নজরুলের কবিতার প্রধান বিশিষ্টতা।"

কেবলমাত্র কবিতার জন্যই নজরুল কবিতা রচনা করেন নাই। প্রায়শঃ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক কোনো-না-কোনো একটা প্রশ্ন বা উদ্দেশ্য জড়িত আছে তাঁহার কবিতাবলির

WB (S-V) P–25

গভীরে। কিন্তু বিষয়ের বিষয়, উদ্দেশ্যই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া কবিতাকে প্রচারকের স্লোগানে পরিণত করে নাই—কাব্য শিল্পের সৌন্দর্য ও রস এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। কবির মনের কথা বা বক্তব্য সহজ সাবলীল ভাবে পাঠকের মনের দুয়ারে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এইখানেই কবি ও কবিতার সার্থকতা। কবি নজরুল এই দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যই সার্থক। স্থির বিশ্বাস, যতদিন 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল পৃথিবীর 'আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে' ততদিন নূতন হইতে নূতনতর ভাবে নজরুল কাব্য সম্ভারের মূল্যায়ন হইবে।

❑ নজরুল সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ❑

নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা নয়—ভক্তি ও প্রেমের কবিতা ও গান, ... অনেকগুলিই বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। তবে যে আমরা এখনো উন্মাদনার কবিতাগুলি নি... মাতামাতি করছি তার কারণ অদ্যাবধি আমরা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছি, কবি এগিয়ে গিয়েছেন। ... ও আমাদের মধ্যে কম ক'রে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান।"

[নজরুল কাব্যের মূল্য বিচার (প্রবন্ধ)—প্রমথনাথ বি...

"কাজি নজরুল ইসলামের নামটির একটিই অর্থ আছে। আনন্দিত আর অপরিমিত যৌবন। প্রাণ... যৌবন কোনো অন্যায়, কোনো মিথ্যা, কোনো বিষাদ, কোনো ভণ্ডামিকে সহ্য করে না—তাই তিনি স্ব... বিদ্রোহী। 'জয় সত্যম্ মন্ত্র শিখা' তাঁর বুকের ভিতরে জ্বলছে অম্লান আলোক; সেইজন্যই 'কারার ঐ... কপাট' ভেঙে 'রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী' ভেঙে ফেলাই তাঁর সংকল্প—তা রাষ্ট্রিক, সামাজি... আর মানবিক যারই হোক।"

[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্...

"সংগীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌথ চেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ প্রীতি, নারীর মর্যাদায় বিশ্বাস, গণমু... প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যেও এ সকল ভাবেরই প্রাধান্য, ত... সংগীতে সে প্রকাশ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে সংসাধিত হয়েছে সে-কথা বলা দরকার। কেন না... ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত হয়েছে—সুর-সৌন্দর্য। বাণী আর সু... মিলে কাজি নজরুলের অদম্য প্রাণে আবেগ চমৎকার এক সুসমঞ্জস শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নজরুল সংগীত জীবনের সূত্রপাত করেন বাংলা গজল রচনার দ্বারা। বাংলা ভাষায় এ চি... একবারেই অভিনব।"

[নারায়ণ চৌ...

"অসহযোগ আন্দোলনের অধ্যায় সমাপ্ত হল, কিন্তু চারণ-কবি নজরুলের মনে সামাজিক ... আন্দোলন নীরব হয়ে এল না। বৈদেশিক শাসন আর শোষণই তো শুধু নয়, নিজেরাই নিজেদের শ... শোষণ করে চলেছি আমরা অবিরত, আর তারই দরুণ মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে... 'নরনারায়ণে' আমরা পদাঘাত করি, 'জাতির নামে বজ্জাতি' করি, অবমাননা করি স্ত্রী জাতির—... আমাদের মনুষ্যত্ব? নজরুলের মানবীয় অনুভূতির রং সাম্যবাদের অরুণাভায় উদ্ভাসিত হয়ে ... আবার। পুরোনো দেশে পুরানো জীবনের চারপাশে যে অসার জঞ্জাল জড়ো হয়েছে—তার থে... থেকে মুক্ত হওয়া চাই। সমাজের সচেতন শ্রেণির এই আকাঙ্ক্ষা কবিতা হয়ে উঠলো নজ... ভাষায়—নজরুলের সদা জাগ্রত অনুভব শক্তি সমাজের এই মূক অনুভূতিকে স্পর্শ করে গেল।

[বাংলার শেষ চারণ-কবি (প্রবন্ধ—সঞ্জয় ভট্টা...

নজরুল সম্পাদিত : 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশে কবিগুরুর শুভেচ্ছা :

কাজি নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু—

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন ঃ
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক্ মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন!

২৪শে শ্রাবণ ১৩২৯

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১। পঠিত কবিতা অবলম্বনে নজরুলের দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দাও।

উত্তর। আমাদের দেশ বহুকাল ছিল পরাধীন। এই পরাধীনতার বিরুদ্ধে এবং বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছেন তাঁরাই দেশপ্রেমিক বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এবং যাঁরা পরাধীনতা বা বিদেশি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁরাও দেশপ্রেমিক আখ্যা পেয়েছেন। অতএব এ থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াইটা হচ্ছে দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রেম। কিন্তু এটাই সব পরিচয় নয়, কারণ পরাধীনতা তো শুধু একটি বিষয়েই নয়, মানুষ তার অভিষ্ঠ লাভের পথে এগিয়ে চলতে চায়, কিন্তু পথে কত বাধা। অনেক বাধা তার নিজেরই সৃষ্টি। অনেক শিকল সে অজ্ঞানতাবশত বা অভ্যাসবশত নিজেই নিজের পায়ে পরিয়েছে। ভীরুতার শিকল, অর্থহীন আচারের শিকল, হীনতাভাবের শিকল, এ সবই মানুষকে পরাধীন করে রাখে, একটি দেশের বা একটি জাতির পরাধীনতার এই সামগ্রিক রূপ যাঁর চোখ ধরা পড়ে, এবং জাতিকে সকল পরাধীনতার শিকল ভেঙে ফেলতে সাহায্য করেন, তিনি বড়ো দেশপ্রেমিক। তার অর্থ হল দেশপ্রেমিক হতে হলে তাঁকে মানবপ্রেমিক হতে হবে আগে। রাষ্ট্রীয় পারধীনতা থেকে মুক্তি দেবার পূর্বধাপ হচ্ছে মানুষের মনকে বহু জাতীয় পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া। এই দুটি কাজ একই সঙ্গে চলতে পারে, দেশপ্রেম মানবপ্রেমের পরিপূরক, দুয়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। কবি নজরুল ইসলাম এই গুণে বিভূষিত।

কবি নজরুল যে সকল দেশাত্মবোধক কবিতা গান রচনা করেছেন তাতে মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম দুই-ই পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে। এইখানেই নজরুলের কবি-মানসের আসল পরিচয়। দেশপ্রেমের নামে উত্তেজনাপূর্ণ গান রচনা করে বিদেশি শাসক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সহজে উত্তেজিত করা যায়। মুমূর্ষু লোকও তাতে ক্ষণকালের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেটি হল সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, সহজ কবিত্ব শক্তি থাকলে যে-কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক গান বাঁধতে পারে। তার মধ্যে গভীরতার পরিচয় না থাকলেও চলে, হৃদয়ের পরিচয় না থাকলেও চলে। কবি নজরুল সে পথের পথিক নয়। তাঁর দেশাত্মবোধে বড়ো কবির কাছ থেকে অপেক্ষিত পূর্ণতারই পরিচয় মেলে। কারণ, তিনি যথার্থ কবিধর্মী। যথার্থ কবিধর্মী সেই মনকেই বোঝায়, যার মধ্যে মানুষের প্রতি প্রেমে কোনো ভেজাল নেই। কবি নজরুল এই হিসাবে যথার্থ কবি। তাঁর কাব্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা, মানুষের আত্মার অসম্মান জনিত তীব্র ক্ষোভ কবির মনের একটি ভঙ্গিমাত্র। মনুষ্যত্বের উন্মেষ না হলে দেশাত্মবোধ অর্থহীন একথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।

কবি নজরুল ভারতীয়। ভারতবর্ষই হল তার দেশজননী। জন্মের পরেই দেখেছেন দেশজননীর মুক্তির জন্য কত শত বিপ্লবীর দল প্রাণ দিয়েছেন—প্রাণ দেওয়ার জন্যে আরও কত বিপ্লবী দল তৈরি হয়ে আছে। তখন মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে এদেশে শুরু হয়ে গেছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। কবি গান্ধিজির অহিংসা নীতির প্রতি প্রথম দিকে আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনকে অসার বলে মনে করেন। তাই তিনি এইরূপে শান্তির বাণী আর চরকার সুতা কাটার প্রতি বিশ্বাস রাখলেন না। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তিনি সরাসরি গান্ধি বিরোধিতা করেছেন—কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে যখন তিনি বলেন—

এল কোটি টাকা এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ।
যার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি বাঘ খাওহে ঘাস।
হেরিনুর জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ॥

তখন আর তিনি গান্ধিজির অহিংসা নীতির পথে না বেছে সাম্যবাদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশজননীর মুক্তি আসতে পারে। তাই তিনি সেই সব যুবকদের আহ্বান জানালেন, যারা একদিন চরকায় সুতা কেটে মিথ্যার তাঁত বুনে চলেছিল—

'জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।"

কবি নজরুল সশস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্রে সকল ভারতবাসীকে দীক্ষা দেন। তাদের সকলের কাছে একান্ত কাম্য হবে দেশজননীর মুক্তি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আহ্বান করেছেন, তাদের কাছে জাতি ধর্ম বড়ো নয়, বরং জাতপাতের বৈষম্য ভুলে গিয়ে মাতৃমুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাই তিনি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় বলেছেন—

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পন।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার॥"

কবির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একদিন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসবে। দেশের প্রতি কবির ভালোবাসা ছিল অগাধ, দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল বলেই তিনি এমন করে বলতে পেরেছিলেন—

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার॥"

ব্রিটিশের সঙ্গে আপোসের রাজনীতি তিনি পছন্দ করতেন না। শোষক ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার প্রবল প্রতিবাদের সুর শোনা যায় 'শিকল ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত এই স্বদেশি সংগীতটির মধ্য দিয়ে—

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী॥"

সন্ধ্যা কাব্যের 'অন্ধ স্বদেশ দেবতা' কবিতাটিতেও স্বদেশপ্রেমের গভীর পরিচয় বিধৃত। ব্রিটিশ শোষণে জর্জরিত হয়েছে দেশজননী। অথচ এই দেশজননী একদিন বিদেশির নাগপাশ থেকে হবেই কবির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গান শুনিয়েছেন ওই কবিতায়—

ওরে ওঠ ত্বরা করি
তোদের রক্তে রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী।

'ফরিয়াদ' কবিতায় কবি পরিষ্কারভাবে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অমানবিক অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছিলেন—ঈশ্বরের সাম্য নীতি অমান্য করে এরা কালো চামড়ার মানুষদের শোষণ করে চলেছে, তাই ঈশ্বরের কাছে তাঁর অভিযোগ—

সাদা রবে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান,
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান,
ভগবান ভগবান।

'বিদ্রোহী' কবিতায় স্বোচ্চার কণ্ঠে কবি যখন গেয়ে ওঠেন—

বল বীর।
চির উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর।

তখন মনে হয় কবি দেশের মানুষকে আত্মবিশ্বাসের মহিমায় জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, একটা জাতি যখন বহুদিনের পরাধীনতায় নির্বীর্য হয়ে পড়েছে, নিজের শক্তিতে শ্রদ্ধা নেই, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নামক কোনো অনুভূতি নেই, তখন তার কানেই তো আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র ধ্বনিত করা সবচেয়ে আগে দরকার। একাজ করতে গিয়ে কবি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার যে কত বড়ো পরিচয় দিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের দেশ ও জাতির পরম দুর্ভাগ্য, কবিকণ্ঠ দীর্ঘকাল স্তব্ধ, ভাষাহীন। যিনি এই দীর্ঘকাল বঙ্গবাসীকে অকৃপণ দানে সম্পন্ন করতে পারতেন, দুর্দিনে দেশ ও জাতিকে কল্যাণের পথের নির্দেশ দিতে পারতেন, তাঁর এই নীরবতা গভীর বেদনাদায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই বোধহয় কবি নজরুলের জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি, তবে আমাদের সান্ত্বনা এই যে, নজরুলের সাহিত্য সাধনা দীর্ঘকালব্যাপী না হলেও তাঁর দানের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। যদি তাঁর রচনাসম্ভার থেকে নতুন করে মনুষত্বের প্রেরণা ও দেশাত্ম প্রেমের মন্ত্র লাভ করে এবং যুগসংকট হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করি, তবেই তিনি চির অমর হয়ে থাকবেন আপামর পাঠক শ্রেণির কাছে।

২। নজরুলের কবি মানসের বৈশিষ্ট্য।

অথবা, নজরুল এক বিচিত্র কাব্য ভাবনার অধিকারী,—আলোচনা করো।

অথবা, রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের মধ্যে নজরুলই একমাত্র গতিশীল জনপ্রিয় কবি, —আলোচনা করো।

অথবা, নজরুল নিজেই একটি আলাদা জগৎ তৈরি করেছিলেন—যে তাঁর ভাবের জগৎ সংগ্রামের জগৎ—সাম্যবাদের জগৎ।

উত্তর। ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগনে। ভারতবর্ষ তখন রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ কবি ও গুরুদেব বলে বরণ করে নিয়েছে। সেই একচ্ছত্র উজ্জ্বল অপ্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্র-সাম্রাজ্যে পৃথক একটি স্বাধীন ভূখণ্ড স্থাপনের জন্য যাঁরা প্রথম সংগ্রামী চেতনার প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য অগ্রগণ্য নজরুল তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় প্রথমে যে তিনজন কবির মৌলিক পথে যাত্রা করার দুঃসাহস দেখেছি তাঁরা হলেন, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজি নজরুল ইসলাম। মোহিতলাল ইন্দ্রিয় সচেতন ভোগবাদ সর্বস্ব মানব জীবন পিপাসার সুন্দরময় অভিব্যক্তি। বাস্তব জীবনের অসঙ্গতি দুঃখ ও নৈরাশ্যের হাহাকার, ঈশ্বর বিদ্রোহী চেতনার সার্থক রূপকার ইঞ্জিনিয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ। আর প্রচলিত লালিত বাণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যিনি অগ্নি বীণার বিদ্রোহের সুরু ও কণ্ঠে বিশেষ বাঁশি বাজিয়ে ভাঙার গান গেয়েছিলেন, যুগান্তরের গোধূলি লগ্নে সেই মানবতাবাদী কবি নজরুল রাতারাতি জনমানসের দরজায় উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা যুগান্ত বলেছি এই কারণে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী চরম ধাক্কা খাওয়া যে চেহারা তা মানব সভ্যতার নিকট একটি নূতন হুঁশিয়ার।

এই সময় যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর বলাকা কাব্যে 'নবীন প্রাণ' ও সবুজ তাজা হৃদয়ের বন্দনা গেয়ে 'বন্দরের কাল হল শেষ' বলে যে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অগ্নি স্বাক্ষর—প্রখরভাবে দাবানল হয়ে ছাড়িয়ে পড়ল বিংশ শতাব্দীর কবি বিদ্রোহী নজরুলের হৃদয়ে—হাবিলদারী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ও তার অবসান ঘটিয়ে—'ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে' 'অট্টহাস্যে আকাশ খানি কেড়ে' বাংলা কাব্য পদাপীঠে নূতন সংযোজিত সুর ও বাণীর এক উচ্ছ্বসিত আবেগ মন্থর বিপ্লব ঘটালেন। জীবনের উপছে

পড়া পেয়ালায় এক বিচিত্র অম্লমধুর স্বাদ ওই শতাব্দীর আর কোনো কবির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে হয় না। জীবন মরমী এই কবি রবীন্দ্র ভাবশিষ্য হয়েও বলরামের চেলা হয়ে পৃথিবী কম্পিত করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যের দরবারে চিরদিনের আজন্ম লালিত সংসার ত্যাগ করে নূতন উন্মাদনার যে প্রবল বার্তা বহন করে এনেছিলেন তা আধুনিককাল ও জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত যুগের বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাথা-নৈরাশ্য ও বিদ্রোহ বিক্ষোভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব অর্জনের দাবিদার নজরুল। রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রথম বলিষ্ঠ সোচ্চার কবিকণ্ঠ তাঁরই।

তাঁর পূর্বে আর কোনো কবি জনজীবনের সঙ্গে কাব্যকে এমন সার্থকভাবে যুক্ত করবার গৌরব দাবি করতে পারেননি। জনজাগরণের জন্য কবি জনজাগরণের যে কতখানি প্রয়োজন ছিল তার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। লাঙল পত্রিকার মাধ্যমে লোকজীবনের বলিষ্ঠ মানসিকতার এক সাংকেতিক ব্যাপ্তি ঘটেছে। বাংলা কাব্যে তরুণ বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের অগ্রগণ্য ভাব্যকারদের তিনি অন্যতম কবি মানস। অসহিষ্ণু আবেগ, বাঁধনহারা চৈতন্য জীবন প্রাতের বেপরোয়া কাব্য আহ্বান এবং মিলিটারি মেজাজে আপোষহীন, জেহাদহীন ঘোষণার বাণীছন্দ তাঁর কবি প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বুকে স্বাধীনভাবে চলার অধিকার চেতনা নজরুলের কবি প্রাণকে উত্তাল করেছিল বলেই কাব্যের ছন্দে ছন্দে এতো ক্ষোভ বিক্ষোভ জ্বালা ও যন্ত্রণা। জীবনের ইতিহাস দুর্বিষহ হতে পারে কিন্তু তার চেয়েও মর্মান্তিক হয় কবি প্রাণ যখন সেই যন্ত্রণা ও পরাধীনতার শিকার হয়ে পড়ে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে তাঁর বিদ্রোহী সভা সম্বন্ধে আমরা সকলে সজাগ। কবি এই বিদ্রোহী রূপের মধ্যে দেশপ্রেম, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়কে আশ্রয় করে যে নৈরাশ্যের আশা ও স্বপ্ন কাব্য রূপ পেয়েছে তা তাঁর কাব্য ধারায় একটি পর্যায়। আর দ্বিতীয় ধারায় তিনি বিদ্রোহী নন সাম্যবাদের মন্ত্রশিষ্য নন, এখানে তিনি প্রেমিক রূপে পরিচালিত—মানবিক প্রেম, বাৎসল্য ও প্রকৃতি প্রেমে চিরদিনের এক উপাসক কবিসন্তান, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, পূবের হাওয়া ও সিন্ধু হিল্লোলের মধ্যে তাঁর প্রেমিক হৃদয় কল্লোলিত হয়েছে। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'আমার সুন্দর এলেন কবিতা হয়ে'। এই সুন্দরের সাধনা সব প্রেমিক কবির সাধনা। তৃতীয় ধারায় জীবনী বিষয়ক কবিতাগুলি ঠাঁই পেয়েছে যার মধ্যে এক অখণ্ড কবিমানস স্বতই প্রকাশিত। যেমন—চিতনামা মরুভাস্কর, এই বিভিন্ন ধারা কাব্য স্ফূর্তির প্রকাশের মধ্যেই কবি যেন পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র মানব সন্তান যিনি তাঁর মাতৃঋণ শোধ করতে চান কিছুটা কাব্য ও শিল্প সাধনার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি এমন করে আত্মসমর্পণের জন্য সাহিত্য শিল্পের কাছে নতজানু হয়নি। তিনি বলেছেন—পৃথিবীর ঋণ ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানব ঋণ তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণ রূপে শোধ না করে কেউ যেন না যেতে পারে। এই আর এক ভারত চেতনার মূর্ত উদ্যোক্তা, কবি নজরুল যা মানব চেতনার আর এক বিকল্প রূপ।

নজরুলের মধ্যে আমরা কয়েকটি কবিচেতনার প্রকাশ দেখি, যেমন—(ক) স্বদেশ চেতনা (খ) প্রকৃতি চেতনা-সুন্দরের ভাবনা (গ) প্রেম চেতনা (ঘ) সাম্যবাদ চেতনা (ঙ) মানবতাবাদ। আবার এই চেতনাগুলি বিশেষ করে স্বদেশ চেতনা ও মানবতা চেতনা নানা ছদ্মবেশে তাঁর কবি চেতনার মধ্যে উঁকি দিয়েছে। এগুলি হল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক। কবি নজরুল-এর আগমনই হল পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি কামনার স্বপ্ন ও সংগ্রাম নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনে অত্যাচারিত ভারতবাসী যে নবদিগন্তে উদয়কালের শুভ সূচনা কামনা করেছে তার সপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তিনি। যে ইংরেজ নরশোষক ও মানবতাবিরোধী শাসক বলেই তাই তিনি সেইদিন শান্ত হবেন। "যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। "সামাজিক বৈষম্য, বহুজাত ও বর্ণে বিভক্ত ভারতবর্ষে নূতন কথা নয়, বিশেষ করে এই পুরুষশাসিত সমাজে যেখানে অর্ধেক নারী, যেখানে তার প্রতি পুরুষের এত অত্যাচার ও শোষণ তা কবিপ্রাণকে উদ্বেল করে তুলেছে। সেই কারণে তিনি নারী বন্দনা করেন, বারবনিতা বন্দনা করেন। পুরাণ শাস্ত্র থেকে নথিপত্র উদ্ধার করে সমাজেই চলেছে

ধনী-দরিদ্রের আপোষহীন গুপ্ত লড়াই। যার অনিবার্য করুণ পরিণতি অর্থনৈতিক দুরবস্থা। যে মানব সংসারে শিক্ষা নেই, আলো নেই, অন্ন নেই, জ্ঞান নেই—সেই সংসারে সমাজ তার কাছে অভিশাপ। এই যে দারিদ্র্যের অভিশাপ, মৃত্যুর অভিশাপ—এ বাঙালির গতিশীল জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করেছে। তামাসার পাশা খেলায় পরিণত করেছে। কবির বিদ্রোহ সেখানে, যেখানে 'জাতের নামে বজ্জাতি' ক্ষুধিত সমাজ চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন, সেখানে অমৃতের সন্তান বলে পরিচয় দিতে গেলে হাস্যকর হয়। নজরুল স্বরাজ চায়, স্বাধীনতা চায়, কিন্তু তিলে তিলে অন্নহীন মহামারীর দরখাস্তে নজিরবিহীন স্বাক্ষর করে নয়। ধর্ম ভারতবর্ষের প্রাণ ঐতিহ্য, ও রক্তগত সংস্কার। ভারতবর্ষ কোনো ধর্মের দেশ নয়। যুগে যুগে কালে কালে বিশ্বের নানা জাতি নানা ধর্মের আগমন ঘটেছে এবং ভারতের জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করেছে—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পারসিক, জৈন্য ও খ্রিস্টান—সমুদ্র তরঙ্গের মতো এই ভারতের মাটিতে উত্তোলিত ও বিলীন হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সম্পর্ক ও সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হনন একটি নিয়মিত চালচিত্র হয়ে উঠেছিল প্রায়। নজরুল তাঁর উদার কবিমানসের মধ্য দিয়ে এই বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক দুষ্ট চক্রকে তীব্র করাঘাত আঘাত করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন মৌলানা সাহেব ও নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল। তিনি আরও বলেন—'সবচেয়ে কাছে যারা থাকে দেবমন্দিরের সেই পান্ডারা দেবতার সবচেয়ে বড়ো ভক্ত নয়। বাঙালি সমাজে এই ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি তাঁকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই তিনি কল্যাণ মন্ত্র উচ্চারণ করেন—'নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ/অভেদ ধর্মনীতি/সবদেশ সবকালে তিনি ঘরে ঘরে মানুষের জাতি।' অথবা 'মানুষের ঘৃণা করি। যারা কোরান বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।'

দেশের তরী যখন ডোবে তখন মৌলবাদীরা প্রশ্ন করে 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' কবি বলেন—'ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।' কাল মার্কস বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে সমাজ ব্যবস্থাপনায় এক নূতন বিপ্লব আনলেন। আজকের দিনে তার প্রয়োগ বুদ্ধি নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও নজরুলের সময় তাঁর দাপট ছিল অবিসংবাদিত। সমাজ ব্যবস্থায় মূল ত্রুটি শোষক শোষিতের সম্পর্কের মধ্যে। যতক্ষণ না উৎপাদন ব্যবস্থার লাভভিত্তিক সমবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ সমাজব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। বুর্জোয়া সমাজ শোষণের পক্ষপাতি থাকবেই। তাই তিনি বলেন, "প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস। যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।" মানুষের সমান অধিকার নিয়ে তিনি সাম্যের গান গাইলেন।—"গাহি সাম্যের গান।/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু গরীয়ান।"

কবি মানবতাবাদী এই প্রসঙ্গে কোনো অত্যাবশ্যক আছে বলে মনে করে না। কিন্তু তবুও নজরুল এত স্পষ্ট জোরালো কণ্ঠে মানুষের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ আস্থা স্থাপন করেন যা আমাদের প্রতি মুহূর্তে তাঁর মানব ঐশ্বর্য্য সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। তিনি ধর্মকে দুইভাবে আশ্রয় করেছেন মানবতার সপক্ষে। প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের উদার মহানুভবতা, যে নিছক ধর্ম সংস্কারের অনেক উপরে তার সূত্র সন্ধান। দ্বিতীয়ত, সেই পুরাকালে সূত্র সন্ধানে ব্যপৃত কিছু ধর্মবুদ্ধি মৌলবাদী ধর্মগুরুদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত পেশাদারি ফতেয়াকারী, যাঁরা বৃহত্তর মানবিক কল্যাণকে বিপথগামী ও বিপদ্গামী করেছে। কবি এ সম্পর্কে সচেতন বলে উচ্চারণ করেন—"যত পাপী তাপী সব মোর বোন সব মোর ভাই।" এবং ঘোষণা করেন—"আমরা সৃজিব নূতন জগৎ আমরা গাহিব নূতন গান।"

চির তারুণ্য সবুজ মহাবিপ্লবে কবি পুরোহিত নজরুল বাংলার একমাত্র চারণ কবি। বাংলার দুর্যোগময় ঘনঘটার দিনে নিজের লেখনীকে একই সঙ্গে জ্বলন্ত তরবারি ও ফুটন্ত তুলি করে তুলেছিলেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—"তাঁর মধ্যে বাংলাদেশের সাধক বা মহাজনকে লক্ষ্য করেছিলাম।" আমরা বলতে পারি বিচিত্র কবি মানবের অধিকারী নজরুল বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক দুরন্ত নায়েগ্রা জলপ্রপাত। বাঁধন হারা—বাঁধনই তাঁর মূল মন্ত্র—কাব্য মন্ত্র।

১২। 'বিদ্রোহী' কবিতা অবলম্বনে কবির মানস বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

***অথবা,* 'বিদ্রোহী কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দাও।**

উত্তর। দু-জাতের কবি আছেন। প্রথম শ্রেণিতে তাঁরা পড়েন, যাঁরা অনুকূল পরিবেশ পেলে বুদ্ধি ও আবেগের সুষ্ঠু সমাহারে কবিতা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব করে তোলেন। বলাবাহুল্য কাজি নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রমজীবী পরিবারের অবহেলিত ও অর্ধশিক্ষিত সন্তান জীবিকার প্রয়োজনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ইংরাজ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং হাবিলদারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে কর্মচ্যুত হয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। তাঁরই কবিত্ব ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হল শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর। স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা বিদেশি শাসকের পীড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অদম্য এই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হল বিদ্রোহের নববাণী।

সময়টা ছিল 1921 সালের 27 নভেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলস (Prince of Wales) ভারতে এলেন। বিক্ষুব্ধ ভারতীয়রা পালন করলেন ধর্মঘট, নজরুল লিখলেন—

লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার
নর নায়ারণে হানে পদাঘাত
হেনেছে সত্য প্রত্যাশার
অত্যাচার ! অত্যাচার !

এর কিছু পূর্বে সাপ্তাহিক 'বিজলী' এবং 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটা যুগপত প্রকাশিত হয়ে কবিকে খ্যাতির তুঙ্গ শীর্ষে তুলে দিয়েছিলেন। মানুষের হকের মধ্যে অবরুদ্ধ ক্ষোভ, আবেগ এবং বেদনা এই কবিতার মধ্যে যৌবন জলতরঙ্গের মতো উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছিল। সেখানে কবি একথা বলার স্পর্ধা দেখালেন—

'আমি বিদ্রোহী-ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।'

নজরুলের মুখে এ কবিতাটির আবৃত্তি শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। অভিনন্দিত করেছিলেন অজস্র সম্মানে।

নজরুলের কবিতায় সেদিন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল এমন এক বিদ্রোহের সুর, যার সমজাতীয় উচ্চারণ এর আগে কখনও শোনা যায়নি। সব রোমান্টিক কবিই সমাজ সংস্কার প্রথারীতি চিন্তা ভাবনার চেতনার জগৎ ছিন্ন ভিন্ন করে চিরকালের বিদ্রোহের কথা প্রকাশ করেন। ফরাসি বিপ্লবে রুশোর ভাবধারায় উজ্জীবিত সব দেশের কবিরাই এই বিপ্লবী চেতনা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের ভাষায়। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—

আমি আগন্তুক
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন—

"একদিন শুনেছ যে সুর পরানোতা।
তাই আমি আসিয়াছি
আমার মতন আর নাই কেউ।"

বস্তুত প্রত্যেক কবি যে অভিনব 'আমি'কে প্রকাশ করতে চান সেই আমির এক বিচিত্র উৎসার ও উচ্ছ্বাস দেখা যায় নজরুলের বিদ্রোহীতে—

বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারী আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর।

আকাশ পাতাল সাগর পর্বত নদী গিরি সব অগ্রাহ্য ও পদদলিত করে যে পরমানন্দে বাঞ্ছার মতো ছুটে চলেছে সেই বিদ্রোহীর প্রতিমূর্তি দেখে কে না ভয় পায় ?—

আমি মহামারী আমি ভীতি ও ধরিত্রীর
শাসন প্রকাশ সংহার, আমি উষ্ম চির অধীর।

প্রশ্ন জাগতে পারে—এই 'আমি টা' কে ? উত্তরে বলা যায় যে কবির অন্তোর্সারিত এক বিদ্রোহী সত্তা, যা কবির সৃজনী কল্পনার মধ্যে জগতের যাবতীয় শাস্ত্র, পুরাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ববিধ উপকরণের যোগে এক ভাব স্বরূপে সম্মুদ্ভাসিত। চির দুরন্ত, দুর্ধর্ষ, দুর্মর এই বিদ্রোহী সত্তা আপনাকে ছাড়া কাউকে কুর্নীশ করে না। মহাশক্তিশালীর এই সংহার মূর্তির মধ্যে কবি প্রেম ও করুণার এক অন্তঃলীলা প্রস্রবণ বহমান রেখেছেন। কারণ বিদ্রোহ তো জাতের কল্যাণের জন্য দুঃখ মোচনের জন্য। এই জন্যই কবির

এক হাতে বাঁশের বাঁশরী অন্য হাতে রণতুর্য। ইন্দ্রানী সমাজের স্তরে সব পাপ ও জঞ্জাল ধ্বংস করে প্রচণ্ড আঘাতে মানুষের বেদনার অবসান ঘটাতে তিনি আবির্ভূত।

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।
আমি হল বলরাম স্কন্দে
আমি উপাড়ি ফেলিব বিশ্ব অবহেলে
নব সৃষ্টির মহানন্দে।

উৎপীড়ক শাসকদের ধ্বংস করে নব সৃষ্টির তোরণদ্বারে জগৎকে উপনীত করে আপন কাজ সমাধা করবেন।

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে ধ্বনিবে না।

বস্তুত একথা নজরুলেরই, 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তাই তো তিনি জানিয়েছেন—

প্রার্থনা যারা কেড়ে খায় তেত্রিশকোটী মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ॥

বিপ্লবের এই জয়ধ্বনি শোষণ ও বঞ্চনার অবসান কামনা এই কবিতাতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বিদ্রোহী কবিতাটিতে নজরুলের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা। তাঁর প্রথম কবিতা না হলেও তাঁর কাব্য সংকলনের সর্বাগ্রে এই কবিতাটিকে স্থান দিয়ে সংকলনের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত নজরুলের সৃষ্টিকাণ্ড এই কুড়ি পঁচিশ বছরে কবির মানসিকতার সুর বেশি উত্তরণ ঘটেনি। এই বিপ্লবী চেতনা, প্রকৃতি প্রেম মানবপ্রেমের আবর্তের মধ্যে তার কবিতা ও গান আবর্তিত হয়েছে। কবি ব্যক্তিত্বের এই নানামুখী অভিব্যক্তিগুলি অর্থাৎ মানবপ্রীতি সংস্কৃতি চেতনা, সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি কাব্য ও পুরাণের অধিকার বিদ্রোহী কবিতার ভাব ভূমিতে সন্নিবিষ্ট। কবি যখন বলেন—'আমি অফিয়ামের বাঁশরী, কিংবা

আমি, অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা ব্যথা সুনীবিড়।
কিংবা, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
অথবা পথিক কবির গভীর, পাগলিনী বেনু বিনে গান গাওয়া।

তখন যে সৃষ্ট, স্বর্গীয় দূত, জিব্রাইলের আগুনের পাখা ঘাপটি ধরে সেই মহারুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাই এবং অনুভব করতে পারি কবির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ এই কবিতার মধ্যে ঘটেছে।

বিদ্রোহী কবিতার ভাববস্তু স্বাভাবিকভাবেই যুক্তি অতিক্রমী। কেননা, এখানে বস্তুসত্য অপেক্ষা চৈতন্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। শিল্প সত্য বস্তু সত্য অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে সমাসীন এবং সে জীবনের পরম সত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহী কবিতায় এই পরম সত্যের প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্রই এই যে নিজেকে উপস্থিত করা, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নিজেকে দাঁড় করানো একেও চৈতন্যের অবদান বলা চলে। অস্তিত্বের এই যে প্রবণতা ঘোষণা একে শিল্পীসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ রূপে অভিহিত করা যেতে পারে, বাংলা কবিতার ধারায় শিল্পীর এই যে পরসতা প্রকাশ তা বিদ্রোহী কবিতা ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ। বিদ্রোহী যুক্তি, অতিক্রমী কবিতা হলেও পরাবাস্তব কবিতা নয়। এ কবিতাতে স্বাধীনতার কথাই মুখ্য নয়। এখানে অন্তঃচৈতন্যের মহোত্তম প্রকাশ। কবি পুরাণে ইতিহাসে, বর্তমানে ভবিষ্যতে, সর্বত্রই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত করেছেন। বিদ্রোহী কবিতার সূচনা বর্তমানে, প্রস্থানে ভবিষ্যতে বর্তমান থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল পথের অনন্ত সম্ভাবনা যুক্তির পারম্মর্থে অগ্রসর না হলেও

একেবারে যুক্তি ছিন্নও নয়। এখানে আছে বিদ্রোহের গর্জনের সঙ্গে সুন্দরের বীণাধ্বনি। যিনি ঈশ্বরের বক্ষে পদাঘাত হানতে চান তিনিই আবার কুসুমের ন্যায় কোমল। যিনি নিজেকে বজ্র ও ঝঞ্ঝারূপে ঘোষণা করেন, তারই হৃদয় আবার কুমারীর প্রথম চুম্বনে কম্পিত। সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন "নজরুলের কাব্যদর্শই হল পুরাতনের ধ্বংস আর নতুনের উত্থান—কবিতায় তারই ছন্দোবন্ধ রূপায়ণ। ধ্বংস দেখে কবি ভয় পান না। তিনি নিজেকে নটরাজ, সাইক্লোন ধ্বংস ইত্যাদি ঘোষণার পর গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ও চঞ্চল মেয়ের ভালোবাসায় মদির হন। নজরুলের জীবনাদর্শ ও কাব্যদর্শ বিদ্রোহী কবিতায় নানা রূপকল্পে বিভাসিত।"

তাই বলতে হয়, বিদ্রোহী কবিতায় বহিঃপৃথিবী একই বৃন্তে প্রকাশিত। এখানে বক্তব্য, রূপককল্প, ছন্দ, অলংকার-এর মিনার আকাশ স্পর্শ করেছে তার ভিত্তি কিন্তু চিরচেনা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, বেদনা নিরাশা স্বপ্ন সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত। বিদ্রোহী কবিতার 'অশনি' সংকীর্ণতার বৃত্ত ভেঙে ক্রমশ এগিয়ে গেছে মহত্তম বোধের দিকে—সঙ্কীর্ণতা থেকে বিশালতায় ক্ষুদ্রতা থেকে মহোচ্চতায় অত্যাচার আর নিপীড়নের জগত থেকে মুক্ত স্বচ্ছ দুয়ার দিকে। কবির আমিত্ব বোধের উত্তরণ ঘটেছে আমার ভাবনায়। এক অর্থে 'বিদ্রোহী' আত্মবিবর্তিত কবিতা।

১৩। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার কাব্যশৈলী বিচার করো।

উত্তর। নজরুলের যে কবিতাটি তাঁকে কালান্তরগামী কমি ব্যক্তিত্বের প্রধান অভিধা এনে দিয়েছিল তার নাম 'বিদ্রোহী'। আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধনই এই কবিতাটির মূল বার্তা। কবিতাটি লেখা হয়েছে এক দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস ও আপোষহীন মহাবিদ্রোহীকে নিয়ে। কবিতার শুরুতেই রয়েছে তার স্বীকৃতি—

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।"

সমগ্র কবিতাটিই হয়ে উঠেছে এই সম্বোধিত ও উদ্দীপিত বীরের আত্ম উদ্বোধনের অগ্নি বাণী। কবি 'বীর' বলতে কেবল নিজেকেই নয়, সমস্ত মানুষর মধ্যে অন্তর্নিহিত বীরত্ব শক্তির প্রকাশ-এর ইঙ্গিত করেছেন। কবির বিশ্বাস এই বীর্য, এই বলবত্তাই একদিন পৃথিবীতে শুভবোধ এর জাগরণ ঘটাবে। বাঁধন ছেড়া আবেগময় অগ্নিস্রাবী ভাষায় উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগে কবি প্রকাশ করেছেন তাঁর বক্তব্য। বাক্য ও শব্দের বিন্যাস ও কবিতার ভাববস্তুর উপযোগী হয়ে উঠেছে। এ কবিতায় যেমন আছে খুব ছোটো ছোটো বাক্যের ব্যবহার, তেমনি আছে বেশ দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার। আবার মাঝারি মাপের বাক্যও রয়েছে। তবে দীর্ঘ বাক্যের প্রাচুর্যই বেশী। সবচেয়ে ছোটো ছোটো বাক্যগুলি তৈরি হয়েছে কেবল দুটি করে শব্দ নিয়ে যেমন—

(১) 'বল বীর—'
(২) আমি দুর্বার।

মাঝারি মাপের বাক্যগুলি কমপক্ষে ৩ বা ৪টি করে শব্দ নিয়ে গড়ে উঠেছে। ৪-এর বেশি শব্দও কোথাও কোথাও আছে। যেমন—

(১) আমি চির-উন্নত শির (সমাসবদ্ধ পদকে ১টি শব্দ ধরলে ৩টি শব্দ)
(২) আমি মানি নাকো কোন আইন (৪টি শব্দ)
(৩) আমি চপলা-চপল হিন্দোল! (সমাসবদ্ধ পদকে ১টি শব্দ ধরলে তিনটি শব্দ)
(৪) আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ! (৬টি শব্দ)

২। 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে'—কবিতায় কবির নিসর্গদৃষ্টি আলোচনা করো।

উত্তর। নজরুল রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও প্রকৃতির জগৎ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন। নজরুল প্রকৃতিকে ভালবাসেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁর বিমুগ্ধ দৃষ্টি। সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন এক আনন্দিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে। এই উল্লাস কবির জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে ভেঙে দিয়েছে দুর্বার গতিতে। তাই কবির এই প্রকৃতি যেন বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ারের মতো কবি হৃদয়ের ক্ষুদ্র বন্ধ জলাশয়ে কল্লোল তুলে দেবে। কবি এখানে হাসি-কান্না, মুক্তি ও বন্ধনের আবির্ভাবের পাশে সাগর বিস্ফারিত হয়েছে, আকাশের দিকে বাতাস ছুটছে। ধূমকেতু আর উল্কার আবির্ভাবে সমগ্র সৃষ্টিটাই বিপর্যস্ত হতে চায়—

'ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে;'

এই সৃষ্টির বিপর্যয় দেখে কবির অন্তরে লক্ষ বাগানের ফুল হেসে উঠেছে। অসংখ্য বাগানের ফুলের হাসির কবির অন্তরের তুলনায় যে প্রকৃতি নির্ভরতা ফুটে উঠেছে তা প্রথাবদ্ধ কবি কল্পনা নয়। তা কবির অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত এক কবিহৃদয়ের প্রকাশে রূপান্তরিত ভাব।

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবির অন্তরে এতই আনন্দ যে ফাল্গুন মাস দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। পলাশ-অশোক-শিমুল বসন্তের দেবতার আক্রমণে ঘায়েল হয়ে গেছে। আকাশের দিগন্তকে দিগ্‌বালিকার সঙ্গে তুলনা করে কবি কেবল সমাসোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি করেননি, কবির কল্পনামাধুর্যও স্বীকার করেছেন। কবি এই আনন্দোচ্ছ্বাসকে রূপ দিয়েছেন এক প্রকৃতি-নির্ভর উদ্ভাসনে—'আজ রঙ্গান এলো মুক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চার পাশে"। প্রকৃতির বিচিত্রমুখী রূপকে কবি গ্রহণ করেছেন—

"আজ আস্‌ল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সুদূর
অথবা
ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দূব্‌ঘাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে !"

এখানে আশ্বিন মাস, শিউলি ফুল, দূর্বাঘাসে শিশিরের হাসি প্রকৃতি জগতের এইসব মনোরম রূপরাজিকে কবি গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে সাগর জাগছে, তুফান আসছে, উজান উছলে পড়েছে। কবির মন বল্গাহারা অশ্বের মতো ছুটে চলেছে। এইভাবে কবি সৃষ্টি সুখের আনন্দ-তরঙ্গকে প্রকৃতি

১। 'অভিশাপ' কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

উত্তর। কবিতার নামকরণ তখনই সার্থক হয় যখন কবিতার ভাববস্তু নামকরণের মধ্যে ধরা পড়ে। 'অভিশাপ' কবিতাটি নজরুলের একটি সার্থক প্রেমের কবিতা। কিন্তু প্রেমের যে রূপটি এখানে ফুটে উঠেছে, সে প্রেমে আছে গভীর অভিমান, বঞ্চিত প্রেমিক হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। কবির ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসই অভিশাপ হয়ে কবিপ্রিয়াকে একদিন বিদ্ধ করবে। সেই বেদনার ও দীর্ঘশ্বাসের কাব্যকারু এই কবিতাটি।

নজরুলের রোমান্টিক কল্পনা দয়িতার জীবনকে কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করে তাকে কাব্যভাষায় চিত্রিত করেছেন। কবির অন্তরের অভিমান সংগীতের স্পর্শে অনুরণিত হয়ে কবিপ্রিয়ার নবজীবনকে কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করেছে। এই রূপায়ণের মধ্যে আছে কবির বঞ্চিত জীবনের দুঃখাভিমান। কিন্তু যেখানে কবি এই অভিমানকে প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে অভিশাপের সুর। এই কারণেই অভিশাপ নামটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

কবি বিশ্বাস করেন যে যেদিন তিনি তাঁর দয়িতার জীবন থেকে হারিয়ে যাবেন তাঁর যথার্থ মূল্য তাঁর দয়িতা বুঝতে পারবেন। অন্তপারে সন্ধ্যাতারা উঠবে, কবিপ্রিয়া সেদিন হয়তো সন্ধ্যাতারার কাছে তাঁর বার্তা জিজ্ঞাসা করবেন। কবি সন্ধানে তাঁর প্রিয়জন ছুটে বেড়াবে—বুকে ছবি বেঁধে, পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে কত মরুভূমি-অরণ্য-পর্বত পার হয়ে তখন তাঁর প্রিয়জনকে ছুটে বেড়াতে হবে। জীবনে যাকে দয়িতা বোঝেনি তার অবর্তমানে তাকে খোঁজার যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে। এই অনুভূতির মধ্যে কবির অভিশাপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু অভিমানের সুরে এই অভিশাপ ফুটে উঠেছে বলে কবিতাটির এক অপূর্ব কাব্যব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর রাতে নিদ্রাভঙ্গে বা স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে কবির পরিচিত স্পর্শসুখের স্মৃতি তাঁর দয়িতাকে হয়তো ব্যাকুল করে তুলবে। কবির ছায়ামূর্তি অনুসরণ করতে গিয়ে দেখতে পাবে, যে শয্যা শূন্য, মিথ্যা স্বপ্ন। কবিপ্রিয়া তখন বেদনার্ত হয়ে উঠবে। এই সম্ভাব্য দৃশ্য কবির অভিমান থেকে উৎসারিত হলেও এর মধ্যে অভিশাপের স্পর্শ আছে।

কবিপ্রিয়ার জীবনযাত্রার নানাক্ষেত্রে তার বেদনার মূর্তি কবি প্রত্যক্ষ করবেন। কখনও গানের আসরে, কখনও কবির সমাধিমন্দিরে, কখনও আশ্বিনের শিশির-ভেজা রাত্রে বন্ধুজন-পরিবৃত্ত হয়ে কবিকে বার বার দয়িতার মনে পড়বে। গানের আসরে বন্ধুজনের অনুরোধে কবি-রচিত গান গাইতে গিয়ে দয়িতার চোখ জলে ভরে আসবে, কারণ তাঁর গানে বেহাগের সুর লাগবে। কবিপ্রিয়া যে বঞ্চনা করেছে, সেই বঞ্চনার কথা, সেই ফাঁকির কথা স্মৃতিপথে আসবে। তার অশ্রুহীন চোখ দুটি বেদনায় ভরে উঠবে। শিউলি ফুলের প্রাঙ্গণে ফুল তুলতে গিয়ে দয়িতার কাঁকন কেঁপে উঠবে। কবির সমাধিক্ষেত্র শিউলি-ঢাকা। তার কথা ভেবে মন কেঁদে কেঁদে উঠবে। প্রেয়সীর বুকের মালা তার অন্তরে জ্বালা ধরাবে। কবি মনে করেন সেদিন সকলে তাঁকে বুঝতে পারবে। তার অবর্তমানের শূন্যতায় তার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে। কবির এই

আশা অভিমানের সুরে বাঁধা। কিন্তু এই অভিমানের মধ্যে আছে অভিশাপের ইঙ্গিত। তাই এই কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে নামকরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

'অভিশাপ' কবিতায় কবির স্মৃতি কবিপ্রিয়ার যে বেসুরো ব্যবহার, যে দয়াহীন হৃদয়ের উচ্চারণের চিত্র বর্ণিত আছে, তার কথা বার বার নানা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। কবিপ্রিয়া জীবনের নবপর্বে নতুন বন্ধুর সঙ্গে প্রেম ও প্রীতির ডোরে বাঁধা পড়ে সে যে তাকে বিস্মৃত হয়েছে। এ বেদনা কবির কাছে অবিস্মরণীয়। কবি তাই মনে করেন তাঁর এই বন্ধুত্ব বর্জিত জীবনে তার অতীত স্মৃতি এক করাল ছায়া বিকীর্ণ করবে। এই করাল ছায়া তাকে সুখ দেবে না, তার জীবনের স্বর্ণমুহূর্তে সে সৃষ্টি করবে নিরানন্দের চিত্র। কবির এই অনুভূতি এখানে অভিশাপের মতো ধ্বনিত হয়েছে।

কবির রোমান্টিক মন বিশ্বাস করে যে জ্যোৎস্নায় যেদিন দোলন-চাঁপা ফুটবে, যেদিন কবিপ্রিয়া নীল আকাশ ভরে এক হারিয়ে যাওয়া তারার মধ্যে তাকে সন্ধান করবে। সোহাগ-ভীরু কবিপ্রিয়া তখন অনুতাপে দগ্ধ হবে। তার স্মৃতিপথে উদিত হবে কবির সোহাগের স্মৃতি। এই স্মৃতি তাকে দগ্ধ করবে, তাকে অনুতপ্ত করবে। দুঃসময়ের রাত্রে কবি তাকে যে নিরাপত্তা দান করেছিলেন, তার কথা বার বার কবিপ্রিয়ার মনে হবে। শেষে একদিন কবিপ্রিয়ার ভুল ভাঙবে। তাঁর দেওয়া আঘাতের স্মৃতির মধ্য থেকে ক্লান্ত হয়ে শেষে দয়িত তাঁকে বাহুবন্ধনে বাঁধার আগ্রহ অনুভব করবেন। সেদিন কবিপ্রিয়া তাকে সম্যক উপলব্ধি করবেন।

কবির প্রতি কবিপ্রিয়ার এই হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা এই কবিতায় নানা আভাসে বর্ণনা করা হয়েছে। কবির বেদনাবোধ সেই ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি। এই বেদনাবোধ থেকেই কবির মনে এক দুঃখময় অনুভূতি জেগেছে। এই অনুভূতিই কবিপ্রিয়ার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। এইভাবেই কবির মনোভাব, কবিকল্পনা, অভিশাপের বর্ণে বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই 'অভিশাপ' নামকরণের কাব্যসার্থক্য অসাধারণ।